The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 155-175
ISSN 2306-3920, DOI :

মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : প্রসঙ্গ দিনাজপুর

মোছাঃ সুমনা আক্তার*

[**সার-সংক্ষেপ:** স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম মাইল ফলক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন ছিল পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার সংঘটিত প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন। দ্বিজাতিতত্ত্বের খোলসে আর তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলিম লীগ সরকার এবং তাদের তল্পিবাহকদের ধর্মাচ্ছন্ন, গোঁড়া ও পশ্চাদমুখী চিন্তা-চেতনার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক, উদার এবং প্রগতিশীল চেতনার ধারার উন্মেষ ও জাগরণ ঘটিয়ে ভাষা-আন্দোলন সৃষ্টি করে এক নব-উদ্দীপনা। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সচেতন ছাত্র-জনতা যে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় তা পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের পৌঁছে দেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত প্রথমে সচেতন বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে ঘটলেও পরে তা পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দোলন-সংগ্রামের উর্বর ভূমি নামে খ্যাত দিনাজপুরেও তার প্রভাব পড়ে ভীষণ ভাবে। এতে কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ প্রবীণ রাজনীতিবিদগণ যেমন অবদান রাখেন তেমনি ছাত্র ও যুবনেতা মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম, নূরল হুদা মির্জা ছোটি সহ অনেক তরুণ নেতা-কর্মী পালন করে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভাষা আন্দোলন প্রথম দিকে দিনাজপুর শহরের ছাত্র যুবক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বায়ান্নতে শহর- গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে প্রধানত দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে ১৯৫২'র ভাষা-আন্দোলন দিনাজপুরের মহকুমা ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় সহ বিভিন্ন থানার গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা-আন্দোলনে দিনাজপুরের ভূমিকা ছিল সুসংগঠিত এবং আঞ্চলিক জেলা শহর থেকে অনেকটা অগ্রগামী। এর অন্যতম কারণ ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে দিনাজপুরের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্ব প্রদান,যারা ঢাকা ও দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।]

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম মাইল ফলক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন ছিল পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার সংঘটিত প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন। দ্বিজাতিতত্ত্বের খোলসে আর তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলিম লীগ সরকার এবং তাদের তল্পিবাহকদের ধর্মাচ্ছন্ন, গোঁড়া ও পশ্চাদমুখী চিন্তা-চেতনার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক, উদার এবং প্রগতিশীল চেতনার ধারার উন্মেষ ও

* **মোছাঃ সুমনা আক্তার** : এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জাগরণ ঘটিয়ে ভাষা-আন্দোলন সৃষ্টি করে এক নব-উদ্দীপনা। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সচেতন ছাত্র-জনতা যে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় তা পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের পৌঁছে দেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত প্রথমে সচেতন বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে ঘটলেও পরে তা পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দোলন-সংগ্রামের উর্বর ভূমি নামে খ্যাত দিনাজপুরেও তার প্রভাব পড়ে ভীষণ ভাবে। এতে কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ প্রবীণ রাজনীতিবিদগণ যেমন অবদান রাখেন তেমনি ছাত্র ও যুবনেতা মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম, নূরল হুদা মির্জা ছোটি সহ অনেক তরুণ নেতা-কর্মী পালন করে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভাষা আন্দোলন প্রথম দিকে দিনাজপুর শহরের ছাত্র যুবক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বায়ান্নতে শহর- গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে প্রধানত দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে ১৯৫২'র ভাষা-আন্দোলন দিনাজপুরের মহকুমা ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় সহ বিভিন্ন থানার গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা-আন্দোলনে দিনাজপুরের ভূমিকা ছিল সুসংগঠিত এবং আঞ্চলিক জেলা শহর থেকে অনেকটা অগ্রগামী। এর অন্যতম কারণ ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে দিনাজপুরের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্ব প্রদান,যারা ঢাকা ও দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হলেও 'মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : প্রসঙ্গ দিনাজপুর' শীর্ষক বিষয়ের উপর তেমন কোন মৌলিক গবেষণা হয়নি বললেই চলে। এক্ষেত্রে দিনাজপুরে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে সমসাময়িক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে দিনাজপুর জেলার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্নতর। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ও সংকট সৃষ্টি হয়। ভাষা আন্দোলন এমন একটি সময়ে হয়েছিল যখন তেভাগা আন্দোলন,১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ও ভারত বিভক্তির রেশ কাটেনি। ঠিক এমন এক জটিল পরিস্থিতিতে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অধিকার কে পদদলিত করে ধর্মের দোহাই দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। যৌক্তিক কারনেই বাঙালি তা মেনে নেয়নি। সারা বাংলার মানুষের ন্যায় দিনাজপুর জেলার মানুষও রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা সংগ্রামমুখী ছিলেন। দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, ১৯৪৮ এর ভাষা আন্দোলনের আগেই ভারতের কলকাতা ও বিহার প্রদেশে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গায় অনেক মানুষ নিহত হয়। ফলে দেশ বিভাগের পর প্রাণের ভয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর, সৈয়দপুর ও পার্বতীপুরে প্রায় ৫০ হাজার অবাঙ্গালী উর্দু ভাষাভাষী বিহারী মোহাজের পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য দিনাজপুরের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। শহরের ঘাসিপাড়া, নিউ টাউন, এলাকায় এরা আশ্রয় নেয়। দিনাজপুর শহরে শহরবাসী মানবিক কারণে মোহাজেরদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মোহাজেরদের জন্য গোলকুঠি মাঠে 'নুরুল আমিন মার্কেট' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। তাদের আবাসিক পুনর্বাসনের জন্য শহরের পূর্ব দিকে আনন্দ সাগর এলাকায় একটি বিশাল এলাকা নিয়ে উপশহর নির্মাণ করা হয়। শহরে হিন্দু ও মাড়োয়াড়িদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, আড়ত, ধানকল, চালকল ইত্যাদি মোজাহেরদের দেয়া হয়। আমদানি-রফতানির লাইসেন্স ও রেশন দোকানগুলির ব্যবসায়িক অধিকার মোহাজেরদের দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় বাঙালিদের তুলনায় মোহাজেররা অর্থনৈতিকভাবে অনেক পোক্ত অবস্থানে চলে যায় এবং সরকারের মদতপুষ্ট হতে থাকে। একটা পর্যায়ে দিনাজপুর শহরে মোহাজেররা মোট জনসংখ্যার 'ছয়

আনায়' উপনিত হয়। যার কারণে তাদের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের একটি মানসিক বিরোধ তৈরি হয় কিন্তু দিনাজপুরে ভাষা আন্দোলন শুরু হলে তারাই অবজ্ঞার চোখে দেখে এবং ক্ষমতাসীন ও তাদের সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করে (জুয়েল, ১৯৯১:৭)।

১৯৪৭ সালের পর মোহাজেররা পূর্ব বাংলায় প্রবেশের পরেই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে নানাভাবে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার করতে থাকে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। মোহাজেররা তাদের সম্প্রদায়ের উর্দ্ধতন কর্তা ব্যক্তিদের দ্বারা নানাভাবে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে থাকে। কামরুউদ্দীন আহমদ এই বিষয়ে জানিয়েছেন যে, ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ ছিলেন বিহার আগত মানুষ। তিনি মোহাজেরদের অন্যায়ভাবে অনেক সুবিধা দিয়েছিলেন। তিনি একজন মোহাজেরকেই হিন্দুদের ফেলে যাওয়া দুই-তিনটি বাড়ি বণ্টন করেছিলেন, ঢাকা শহরে যত রেশনের দোকান হয়েছিল তার সবই মোহাজেরদের ভিতর বিতরণ করা হয়েছিল। হিন্দুদের বাজেয়াপ্ত করা সব আগ্নেয় অস্ত্র এই বিহারিদের ভিতর বণ্টন করা হয়েছিল। ট্যাক্সি চালানোর সব লাইসেন্স এরাই লাভ করে। বিহার থেকে যত মানুষই এসেছে তারা সবাই রেল বিভাগে চাকুরি পেয়েছে। এই সময় প্রায় ১৪ হাজার বিহারি রেল বিভাগে চাকুরি লাভ করে (আহমদ, ২০২০:২১৭)।

সরকার বিহারি শিশুদের জন্য নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়, তারা এই ধরনের বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। বাঙালিরা উপলব্ধি করে একমাত্র ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হলে তারা এগোতে পারবে। যখন মুসলিম লীগের কেন্দ্রিয় নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান ১৯৪৭ সালের ১৭ মে জানান, "উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে"। তখন কিছু সংখ্যক বাঙালি সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ হিন্দি কে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কোনো প্রতিবাদ কেউ করেনি। মুসলিম লীগ মহলেও এ নিয়ে কোন বিতর্কের সূচনা হয় নি। কিন্তু জিয়াউদ্দিন আহমেদের এই সুপারিশের অসারতা সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন (উমর, ২০১২:১৯ - ২০)যেখানে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র শিক্ষক একত্রিত হয়ে 'তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আবুল কাশেমের নেতৃত্বে এই সংগঠনটির জন্ম হয়। এর প্রথম সভাটি হয়েছিল প্রফেসর আবুল কাশেমের আজিমপুরের বাসায়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শাহেদ আলী ও তার স্ত্রী চেমন আরা এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম সংগঠক ছিলেন। 'তমদ্দুন মজলিস'-এর পক্ষ থেকেই 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে প্রথম বই বের করা হয়। ভাষা কেন্দ্রিক এই প্রতিবাদী মনোভাবকে গঠনমূলক রূপ দেবার তাগিদে 'তমদ্দুন মজলিস' অক্টোবর মাসে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। আহবায়ক ছিলেন প্রফেসর নূরুল হক (উমর, ২০১২:৫৩)।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিতে প্রথম বিক্ষোভ ছিল ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে। নতুন পাকিস্তানের শাসকদের গৃহীত নব পদক্ষেপ ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এমনকি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এইসময় পাকিস্তান সরকারের প্রকাশিত এনভেলপ, পোস্টকার্ড, মানি অর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট, রেল টিকিট ইত্যাদিতে উর্দু ও ইংরেজি ব্যবহার করা হয় এবং দুঃখজনকভাবে বাংলা বাদ দেয়া হয়। এই বিষয়টি বাঙ্গালিদের নিদারুনভাবে মর্মাহত করে তোলে। তারই প্রতিবাদে নীলক্ষেত ব্যারাকে বসবাসকারী সরকারি কর্মচারীদের একটি বিশাল অংশ ব্যারাক প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়ে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এখানেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি উঠে আসে। এখানে উচ্চারিত শ্লোগানগুলি ছিল- 'সবকিছুতে

বাংলা চাই', 'উর্দুর সঙ্গে বিরোধ নাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। উল্লেখ্য বিষয় ছিল যে, এই প্রতিক্রিয়াজনিত বিক্ষোভের মধ্যে কোন সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সংগঠন জড়িত ছিল না। পরবর্তীতে সরকারের নেয়া নানা ধরণের পদক্ষেপ ভাষা আন্দোলনকে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে সাহায্য করে।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা ভাষার পক্ষে সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়। কারণ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শাসকগোষ্ঠী এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয় যে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে। শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর দুপুর ২টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সেটি ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসমাবেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এই বিরাট সমাবেশে যোগদান করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম। এই সমাবেশে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ.কে.এম. আহসান ও এস, আহম` (*Morning News,* December 7th, 1947*)*. অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের কাছে বাঙালির এসব সভা সমিতির ও মিছিল কোন অর্থই বহন করেনি। বরঞ্চ তারা এটাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেছিল।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী সম্মেলনে বৃহত্তর দিনাজপুর থেকে ছাত্রনেতা মোহাম্মদ দবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে মোস্তফা নুরুল ইসলাম, এম. আর. আক্তার মুকুল ও আব্দুর রহমান চৌধুরী যোগদান করেছিলেন। এই কর্মী সম্মেলন ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, "বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তান এর শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হোক হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হোক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক" (উমর, ২০১৩:২৬)।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় নাঈম উদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হলে এর কমিটিতে দিনাজপুর জেলা থেকে মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম সদস্য নির্বাচিত হন (রায়, ২০১৬:১০৯)। বাঙ্গালীদের অধিকার আদায়ের গৌরব জনক অধ্যায়ে অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আন্দোলন প্রভৃতিতে যে কজন তেজদীপ্ত ছাত্রনেতা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে দিনাজপুরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম ছিলেন অন্যতম। তখন তেভাগা আন্দোলন পরবর্তী দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন সক্রিয় থাকলেও প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দিনাজপুরের মুসলিম ছাত্রসমাজের কাছে তেমন আস্থা অর্জন করতে পারেনি। এ সময় মোহাম্মদ দবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সুগঠিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৩১ জানুয়ারি রাজশাহীতে একটি আঞ্চলিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ। দিনাজপুর থেকে অংশগ্রহণকারী নেতারা বাংলা ভাষার দাবিতে অনড় ছিলেন এবং এরাই এই আন্দোলনকে সারা জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার নানা পরিকল্পনা নিতে থাকেন। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের এই অধিবেশনে উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা দাবি উত্থাপন করেন(*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির উপর গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন যে;

> "Pakistan is a Muslim state and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation. The mover should realise that Pakistan

> has been created because of the demand of hundred million Muslims in this subcontinent and the language of the hundred million Muslims is Urdu. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language" (Akanda ,2013:24).

তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ও দিনাজপুর জেলার প্রেম হরি বর্মন ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তাব সমর্থন করেন (রায়, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০)। পূর্ব বাংলার কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাবটি ২৫ শে ফেব্রুয়ারি তুমুল বিতর্কের পর প্রত্যাখ্যাত হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই দিনাজপুরেও ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তাই আমরা দেখি, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে ২৯ ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সংবাদটি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৪৮ সালের ৫ মার্চ তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ভাষায় : (বিশ্বাস, ১৯৯৫:১০)।

"পার্বতীপুরে তীব্র প্রতিবাদ সভা"

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষায় বাংলাকে স্থান না দেওয়ায় ২৯.০২.১৯৪৮ তারিখে পার্বতীপুর, জ্ঞানাঙ্কুর এইচ.ই. স্কুল, রেল প্রাইমারী ইউপি স্কুল এবং গার্লস এম.ই. স্কুলের অনুমান ১০০০ ছাত্র-ছাত্রী উহার প্রতিবাদকল্পে স্কুলে যোগদান না করিয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া হাই স্কুলের ময়দানে সমবেত হয়। হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র এম. শহীদ সাহেবের সভাপতিত্বে এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

১. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে বাদ দেওয়ায় এই সভা গভীর বেদনা ও তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

২. করাচি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশের অধিবাসীবৃন্দের মাতৃভাষা বাঙ্গালা কে অচিরে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হউক।

৩. বাঙ্গালা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইতে অপসারিত করায় মূলতঃ বাঙ্গালা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্থানের ৪.৫ কোটি লোককে শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে বিশেষভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে। এবং নগণ্য সংখ্যক উর্দুভাষী লোককে দেশের সর্বাধিকারের সুযোগ দেওয়ায় গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। এই সভা হইতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে।

৪. পূর্ব পাকিস্তান যে কয়জন মুষ্টিমেয় ধুরন্ধর স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া স্ব স্ব মতলব হাসিল করিবার মানুষের বাংলা ভাষাকে বলি দিয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদেরকে মুখোশ খুলিয়া দিয়া তাহাদের দূরভীসন্ধির মূলোৎপাটন করা হউক।

৫. করাচী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত প্রতিনিধি বাঙালার বিরাট জনমতকে উপেক্ষা করিয়া উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, এই সভা তাহাদের কার্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের পুনঃবিবেচনার দাবী জানাইতেছে।

৬. দেশের মঙ্গলকামী জনসংখ্যাকে এবং বাঙালার শিক্ষামন্ত্রীকে উক্ত বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে এই সভা আকুল আবেদন জানাইতেছে।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের বিষয়ে শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ যে বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ

সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছিলেন। তাই ১১ মার্চের হরতালের পূর্বেই দিনাজপুরের সংগ্রামী ছাত্রগণ ও সচেতন মানুষ পাকিস্তানের গণপরিষদে খাজা নাজিমুদ্দিনের মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে ৩রা মার্চ প্রতিবাদ সভা করেছেন। এই খবরটি কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকা* তে ১১ মার্চ ,১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় (বিশ্বাস, ১৯৯৫:১৪)। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় :

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ: দিনাজপুরে হরতাল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

"দিনাজপুর ৩ মার্চ -উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে অদ্য এখানে হরতাল পালিত হয়। স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ ক্লাসের যোগদান না করিয়া মিছিল করিয়া "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "উর্দু চাই না", "আজাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ করে। বিক্ষোভকারীগ অধিকাংশই মুসলমান। অপরাহ্নে খাঁ বাহাদুর জনাব আমিনুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ময়দানে এক বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাঙ্গালা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবি জানাইয়া পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতি। এই মর্মে খাজা নাজিম উদ্দিন সাহেব কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদে যে উক্তি করা হইয়াছে, উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এবং উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আলোচনাকালে গণপরিষদে পূর্ব বাঙ্গালার মুসলমান সদস্যগণের নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করিয়া প্রস্তাবগৃহীত হয়।"

এখানে উল্লেখ্য যে ,১৯৪৮ সালের ১ মার্চের হরতাল ভিত্তিক আন্দোলন শুধু ঢাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ছাত্ররা হরতাল পালন করে ও সভায় মিলিত হয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এছাড়াও দিনাজপুরের পাঁচদোনা ও বক্তারপুরেও এদিন ছাত্ররা ধর্মঘট করে বাংলা ভাষার পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন (ইসলাম, ১৯৮৯:২৩৫)।

১১ মার্চ দিনাজপুরের বীরগঞ্জেও ছাত্ররা হরতাল পালন করে ও সভায় মিলিত হয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে (হেলাল, ১৯৮৫:১৭৩)। সে সময় দিনাজপুর রিপন কলেজ ও মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুল ছিল কলকাতার রিপন কলেজের শাখা কলেজ। মহারাজা স্কুল ভবনে সকালের শিফটে কলেজের ক্লাস হত। "উর্দু ভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দিনাজপুরে ছাত্রদের নেতৃত্বে আন্দোলন ১১ মার্চের পর ব্যাপকতা লাভ করে। আন্দোলনকারী ছাত্ররা টিনের চোঙ্গার মাধ্যমে ছাত্রদের মিছিল মিটিংয়ে যোগ দিতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু প্রথম দিকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি কারণ মহারাজা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালিপদ রায় অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছাত্রদের ক্লাস বাদ দিয়ে মিটিং মিছিলে যাওয়াকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করতেন। ছাত্ররা তাকে প্রচন্ড ভয় পেত। এছাড়াও আরো কিছু শিক্ষক ছিলেন যারা ক্লাস বর্জন বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন, তারা ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন ভবতোষ রায় ব্রজ গোপাল রায় প্রমূখ।এরপরও কিছু কিছু ছাত্র আন্দোলনে এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বড় শ্রেণীর ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা দিবসে ছাত্রদের অংশ নেয়ার জন্য মহারাজা গিরিজা নাথ হাইস্কুলে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে যায়। তারা টিফিনের সময় স্কুলের আম গাছ তলায় ছাত্রদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সহপাঠীদের সঙ্গে অজয় রায় সেখানে সমবেত হন, ওই সময় তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন এবং কলেজ ছাত্রদের মুখে তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা প্রথম শোনেন। বাড়িতে গিয়ে বাবার কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনের ইতিহাস ও তাৎপর্য জানতে পারেন এবং পিতার সম্মতিতেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন (ভৌমিক:১৭৫)। সহপাঠী সাত্তারের উৎসাহে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। কলেজ ছাত্রদের নির্দেশ মতো ছাত্ররা ১১ই মার্চ ক্লাসে না গিয়ে স্কুলের বাহিরে সমবেত হন। মিছিল নিয়ে তারা

জেলখানার সামনে দিনাজপুর ইনস্টিটিউটে জমায়েত করেন। আরো অনেক স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এখান থেকেই ছাত্ররা নানারকম স্লোগান দিতে দিতে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। ১১ মার্চ ধর্মঘট বানচাল করার জন্য সরকারি প্রশাসন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্ররা ১৪৪ ধারা লংঘন করে মিছিল মিটিং ও ধর্মঘট পালন করেন (হোসেন, ২০০৩:৩৪)।

অবশ্য তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসান তোরাব আলী (আই. সি. এস) ছাত্রদের গ্রেফতারের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বদলি হয়ে যাওয়ার পর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিরাপত্তা আইনে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করেন। এ সময় ছাত্রনেতা মির্জা নুরুল হুদা ছোটি, এম. আর. আখতার মুকুল, দবিরুল ইসলাম, গোলাম রহমান ও আসলে উদ্দিন আহমেদকে নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। এসব নেতা ছাড়াও আন্দোলনে তৎপর ছিলেন আব্দুল হক মোস্তফা নুরুল ইসলাম মতিউর রহমান চৌধুরী ও আব্দুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ (ভৌমিক: ২৩৪)।

১১ই মার্চ যথারীতি ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল মিটিং ও ধর্মঘট পালন করা হয়েছিল। ছাত্রদের মিছিলটি দিনাজপুর ইনস্টিটিউটের সামনের মাঠে একত্রিত হয়। অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররাও এখানে জমা হয়। এখান থেকেই ছাত্ররা মিছিল নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এই সময় ছাত্রদের স্লোগান ছিল "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "সকল স্তরে বাংলা চালু কর", "কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র মানি না মানবো না", "বাংলা ভাষার শিক্ষা চাই" ইত্যাদি। অনেকেই মনে করেন যে ১১ মার্চের আন্দোলন বা সমাবেশ ব্যর্থ ছিল। কারণ হিসেবে তারা সেই দিনের শহরের স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে ১১ মার্চের পর আন্দোলন আরো ব্যাপকতা লাভ করে।

দিনাজপুর জেল কারাগারে আটক থাকাকালীন বন্দী ছাত্রনেতারা কারা অভ্যন্তরে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেন। এ আন্দোলন খুব জোরালো ছিল না এবং অন্যান্য হাজতী কয়েদিদের মধ্যেও এর তেমন কোন অবদান ছিল না। কিন্তু এ আন্দোলনের জন্যই ছাত্র নেতাদেরকে একদিন জেল পুলিশের হাতে বেদম মার খেতে হয় (জুয়েল, ১৯৯১:১১)। আটক ছাত্রনেতারা অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তোলেন। তারা পর্যাপ্ত আলো, পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করার দাবি জানিয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই দাবি অগ্রাহ্য করে বরং রিজার্ভ পুলিশ দ্বারা লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় পাকিস্তানি শাসকদের দমননীতির একটি উদাহরণ ছিল, তারা বাঙ্গালীদের কোন রকম ভাবেই তাদের অধিকার দেবে না, এটা বাঙালিরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল। সেদিন ছাত্রদের সঙ্গে আরও অনেক নেতা কেউ লাঠিপেটা করা হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বরদা ভূষণ চক্রবর্তী, আন্দামান ফেরত অরুণ রায় ও কমরেড অভরন সিং (জুয়েল, ১৯৯১:১২)।

দিনাজপুরে ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর ঢাকায় পৌঁছালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের মুক্তির চেষ্টা চালান। তারা বন্দীদের মুক্তির জন্য দিনাজপুর জেলায় আসেন। কিন্তু জেলায় আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দিনাজপুর ত্যাগের নির্দেশ দেন। এর ফলে নেতারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। দিনাজপুরে আশা নেতারা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, আব্দুল আজিজসহ আরো অনেকে (খান,২০০৪:৫৫)।

১৯৪৮ সালের দিনাজপুর ছিল একটি ছোট্ট মফস্বল শহর এবং এখানে একটিও সরকারি কলেজ ছিল না। এ সময় শহরের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩৫ হাজারের মতো, তারপরও ভাষার প্রশ্নে এখানে সুতীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে এবং দিনাজপুরে ছাত্র গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছোট ছোট লোকালয়, গ্রাম ও থানা সদরেও বিক্ষোভ মিছিল ও ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ '*দৈনিক আজাদ*', পত্রিকায় উল্লেখ্য করা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিবাদে ১৩ মার্চ বীরগঞ্জ রহিম বখস হাই স্কুলের ছাত্রগণ হরতাল পালন করে।

এদিনে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্রগণ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাবগ্রহণ করে (বিশ্বাস, ২০২১: ১২৪)।

১৯ মার্চ, ১৯৪৮ *'দৈনিক আজাদ'* পত্রিকায় বলা হয়, ১৩ মার্চ পাঁচদোনাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের সমূহের ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে এবং এই দিনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার এবং দিনাজপুর শহরে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবি করে। এছাড়া তারা বিভিন্ন স্থান থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারেরও দাবী জানায়। এসময় বক্তারপুরেও ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। ১৫ মার্চ ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের সমঝোতা বৈঠক হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে ঢাকায়ও ভাষা আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে (হক, *প্রথম আলো*:২১, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)।

১৯৪৮ এর ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাদেশের সংবাদপত্র গুলোতে বেশ কিছুদিন থেকে চলছিল আরবি হরফে বাংলা লেখা নিয়ে সমালোচনা। এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি উভয়কে নিয়ে জনগণের মাঝে তালগোল সৃষ্টি হয়। কিছুদিন আগে পাকিস্থানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের পেশোয়ারের অধিবেশনে পাকিস্তানের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে একই হরফে লেখার সুপারিশ করা হয়। এ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আরবি হরফে বাংলা লেখা শুরু হয়। সুপারিশে আরোও বলা হয় আরবি হরফে বাংলা লেখা হলে পশ্চিম পাকিস্থান এমনকি সমগ্র মুসলিম জাহানের অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঐক্য সহজতর ও দৃঢ় হবে। এ প্রসঙ্গে দিনাজপুরের নওরোজ পত্রিকার সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হেমায়েত আলী বলেন, "আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রকে সুস্থ ও সুঠামরূপে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সমবেত চেষ্টায় সবকিছু চিন্তা করে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলা বাংলার তাকে জোর করে যদি আরবি হরফে লিখতে যাই, তবে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবার কথা নয়" (আলী, ১৯৪৯:৮৯)।

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত দিনাজপুরের পত্রিকার সম্পাদক হেমায়েত আলি পত্রিকার মাধ্যমে আরবি হরফে বাংলা লেখার সমালোচনা করেন। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি তৎকালীন দিনাজপুরের সাধারণ মানুষের মনোভাব ১০টি যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেন নওরোজ পত্রিকার ভাষায়:

১. অনেকে বলেন, বাংলা আরবি হরফে লিখলে উর্দু ভাষীদের পক্ষে বাংলা শেখা সহজ হবে। এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। বাংলা ভাষায় আরবি বর্ণমালার সহিত তাহাদের পূর্ব পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও বাংলার একই আরবী অক্ষর ভিন্ন উচ্চারণ পরিগ্রহ করবে। তাতে সেগুলি শিক্ষকেরা নতুন অক্ষর শেখার চেয়ে কিছুতেই কম কঠিন হবে না।

২. বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় থাকলেই ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকে না। তাই যদি হতো তবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই আরবি বর্ণমালা জানে, অন্তত কোরআন শরীফ পড়ার খাতিরেই শিখেছে। তবু তারা উর্দুতে একেবারেই অজ্ঞ। আরবি হরফে বাংলা হলে আমরা এই ফেশাদের সম্মুখীন হবো। "ন যবৌ না তস্তৌ"। না হবে বাংলা, না হবে আরবি, না হবে উর্দু।

৩. একই বর্ণমালা লেখা হলেও এক ভাষা আর এক ভাষার সঙ্গে মিশতে পারে না। বাংলা কোন দিনেই উর্দু সঙ্গে মিশবে না। ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায় রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়াও এক ভাষীর পক্ষে অন্য ভাষা শিক্ষা করা মোটেই সহজতর নয়।

৪. একশ্রেণীর লোকের ধারণায় বাংলা বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি খুব বিজ্ঞান সম্মত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত না হলে এ ভাষা এতদিন ধরে টিকে আছে কেমন করে? যাহা হউক, আমরা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের পক্ষপাতী। এ জন্য বাংলা ভাষায় আরবি বর্ণমালা প্রবর্তন করলে অনাবশ্যক তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

৫. আরবি হরফে বাংলা হলে আমাদের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের লেখনি বাধাপ্রাপ্ত হবে। সব লেখক যে আরবি অক্ষরে জ্ঞান থাকবে তা কে বলবেন?

৬. পুস্তক প্রকাশক ও সংবাদপত্রের মালিকদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

৭. বাংলার প্রাচীন ও বর্তমান অমূল্য সাহিত্য ভান্ডার হতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বঞ্চিত করা হবে।

৮. আরবি হরফে বাংলা হলে আমাদের দেশে যতটা মৌলভী -মাওলানার দরকার, ততটা নেই। আবার আমাদেরকে অবাঙ্গালীর কুক্ষিগত হতে হবে। এতে আর্থিক ক্ষতি পূর্ব পাকিস্থানের হবে যথেষ্ট।

৯. দুনিয়ায় অধিকাংশ মুসলমান এই আরবি হরফ ছাড়া তাহাদের কাজকর্ম চালিয়ে থাকেন। আরবি হরফ দিয়া মুসলিম জাহানে সেতু বাঁধার ধারণা অলিক কল্পনা। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, তুরস্কে দুই কোটি, সোভিয়াত রাশিয়ায় দুই কোটি, আলবেনিয়ায় আট লক্ষ, চীনে প্রায় দুই কোটি, ইন্দোনেশিয়ায় সাত কোটি মুসলমান আরবি হরফ ছাড়াই কাজকর্ম চালিয়ে থাকেন।

১০. আরবি কুরআন শরীফের ভাষা অর্থাৎ ধর্মীয় ভাষা। তাই আরবি হরফে বাংলা হলে লোক বেশি আকৃষ্ট এবং নিরক্ষরতা শীঘ্রই দূর হবে। তাই যদি হতো তবে আরবি ভাষী আরব ও ইরান আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে একটিও নিরক্ষর থাকত না; কিন্তু এসব দেশে পাকিস্তানের চেয়েও নিরক্ষর বেশি।

পরিশেষে আমার বক্তব্য: যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বাস্তব দৃষ্টিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও দেশের কর্ণধারদের এদিকে বিশেষ করে কোন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অনুরোধ করি। পূর্ব পাকিস্তানের বহু সমস্যা বিদ্যমান। সেসব সমস্যার সমাধান না করে কেন যে উর্দুভাষা বা আরবি অক্ষর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তার তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারছি না (আলী, ১৯৪৯:৯০)।

মুসলিম লীগ সরকারের আরবি হরফ প্রজননের ব্যর্থ চেষ্টার পথ ধরেই খাজা নাজিমুদ্দিনের পল্টন ময়দানে ঘোষণার ফলে সৃষ্টি হয় বায়ান্নর দুর্বার ভাষা আন্দোলন।১৯৫০ সালে শহরের বন্দি ছাত্র নেতারা জেল খাটার পর মুক্তি লাভ করে। এই বছরেই দিনাজপুর জেলায় আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন রহিম উদ্দিন ,সম্পাদক ছিলেন দবিরুল ইসলাম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন নুরুল হুদা মির্জা ছোটি। (ইসলাম, ২০০৬ :১৩১)।

ছাত্র নেতারা চাইলেন প্রগতিশীল কর্মী তৈরি করে তার এই প্রস্তুতি হিসেবে তারা পাক্ষিক '*জুলফিকার*', নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সম্পাদক ছিলেন নুরুল হুদা মির্জা ছোটি ও আসলেউদ্দিন আহমেদ। এই পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়।

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রথম পর্যায়ে (১৯৪৮) আন্দোলনক্রমে ঝিমিয়ে পড়লেও দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫২) তা অগ্নিরূপ ধারণ করে। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মারা যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন আহমেদ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি বলেন, "পাকিস্তান কে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র রূপে গঠন করতে যাচ্ছি এবং ইসলামের যখন কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই, তখন সেই রাষ্ট্রে কেমন করে প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা যেতে পারে? মরহুম কায়েদে আজম বলেছেন প্রাদেশিকতাকে যারা প্রশ্রয় দেয় তারা পাকিস্তানের শত্রু। তিনি বলেন

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তার এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

৫২ র ভাষা আন্দোলন কেবল ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এমনকি গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতেও বিক্ষোভ, হরতাল, শোভাযাত্রা ইত্যাদি পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দিনাজপুরে অগ্নিরূপ ধারণ করে। এ জেলার স্থানীয় নেতারা ঢাকার ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে তার সমন্বয়ে এতদিন আন্দোলনকে প্রবাহমান রেখেছিলেন। এমন রাজনৈতিক পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতায় আবার শুরু হয় ৫২ এর ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে দিনাজপুরের বিক্ষিপ্ত মানুষ ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়। শহর গঞ্জে বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম ছাত্রলীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলন সংগঠনের রাজপথে নেমে আসে।

২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টনের জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর কথা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিনাজপুরে প্রতিবাদী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।৩১ জানুয়ারি "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" র সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করলে দিনাজপুর শহরেও অনুরূপ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি দিনাজপুরে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রগতিশীল ছাত্রদের নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম পরিষদে ছিলেন বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা। যেমন কমিউনিস্ট বা মার্কসীয় চিন্তাধারার হাজী মোহাম্মদ দানেশ, গুরুদাস তালুকদার, নুরুল হুদা মির্জা, অনিল রায় মুসলিম লীগের বিদ্রোহী নেতা আবুল কাশেম, আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা কর্মীরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ও ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র কর্মীবৃন্দ। আরো ছিলেন তমুদ্দিন মজলিস দিনাজপুর শাখার আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলী, মজলিসের অন্যান্য নেতা আমজাদ হোসেন, খন্দকার ইয়াকুব আলী, আমিনুল হক চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন, আব্দুল মান্নান দেলোয়ার হোসেন, খলিলুর রহমান ও মতিউর রহমান চৌধুরী। ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা রহিম উদ্দিন আহমেদ, নাসিম চৌধুরী মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম, আব্দুল হাফিজ, দলিল উদ্দিন আহমদ ,আমানুল্লাহ সরকার, আমিন উদ্দিন আহমদ, টুকুমিয়া, কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ বাদল প্রমুখ(বার্নিক, ২০০০:৩২৭)। ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টার প্রতিবাদ হিসেবে দিনাজপুরে ধর্মঘট পালন করা হয়। এ সময় দিনাজপুরের ছাত্ররা সভা সমাবেশ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ সহ বিভিন্ন ব্যক্তি এই সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ ছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক তারেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষক বক্তৃতা করেন। এই সভায় বড় ক্লাসের ছাত্রদের পাশাপাশি অজয় রায় ও বক্তৃতা করেছিলেন। সবার শেষে একটি মিছিল দিনাজপুর শহর প্রদক্ষিণ করে কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। এই জমায়েত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র দেশের মতো দিনাজপুর জেলাও ধর্মঘট পালন করা হবে। ওই দিন সবাইকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় (আলী, ২০০২:২০২)। ১০ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল কলেজে ছাত্ররা নিজেদের বিশেষ উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতায় এই কর্মসূচি পালন করেন। লক্ষণীয় দিনাজপুরে স্কুল কলেজের ছাত্ররা ভাষার দাবি ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান (ভৌমিক, ঢাকা: ১৭৫)।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটকে সফল করতে দশ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর ইনস্টিটিউট চত্বরে মির্জা ছোটির সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আরো বক্তৃতা করেন আব্দুল হাফিজ ,আসলে উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। আমিন উদ্দিন আহমেদ ও টুকু মিয়া এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কর্মসূচি ও নির্দেশ দিনাজপুরে পাওয়া যেত টেলিফোন বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি এডভোকেট রহিমের মুন্সিপাড়ার বাসায় বেশিরভাগ বৈঠক ও সভা অনুষ্ঠিত হতো (হোসেন, ১৯৯৯: ৬৮)।

একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সফল করতে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু হয়। বিশেষ গোপনীয়তার চলে পোস্টার লেখা, পোস্টার সাঁটা, ইস্তেহার লেখা, ছাপা ও বিতরণ। এসব কাজে বাম মতাদর্শের ছাত্র-ছাত্রী এবং নেতৃস্থানীয়দের ছিল বিশেষ ভূমিকা (আলী, ২০০২:২০৪) ।তবে বেশি লিখতেন শামসুল ইসলাম মুন্সী, মির্জা ছোটি ও আসলে উদ্দিন। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়েই এগুলো শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করা হতো। ছাত্রনেতা ছোটির অগ্নিঝরা ভাষণ ছাত্রদের উজ্জীবিত করত। তাঁর জ্বালাময়ী ও তেজস্বী বক্তৃতা দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। ছাত্রদের পাশাপাশি কয়েকজন ছাত্রী ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন হামিদা হক, খুকু মনি, কচি মনি, আমিনা দানেশ, রওশ আরা ও জান্নাতুল আরা প্রমুখ (হোসেন, ২০০৩:২৩৫)। কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে দিনাজপুরের সংগ্রাম কমিটির আহবানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারির হরতাল পালনের সব আয়োজন সম্পন্ন হয় ২০ ফেব্রুয়ারি। এক্ষেত্রে পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র নেতারা। দিনাজপুরের রাজনৈতিক মহলেও তখন উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা বিরাজ করে। হরতাল বিরোধী প্রশাসন অনেক আগে থেকেই তৎপর হয়, যাতে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। দিনাজপুরে রাজনৈতিক অঙ্গন তখন ভাষা আন্দোলনের পক্ষ ও বিপক্ষের জনতা প্রশাসন আলোচনা-সমালোচনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সবাই যেন আন্দোলনের কেন্দ্র ঢাকার নির্দেশনার অপেক্ষায় ছিলেন। এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করে; যাতে কোনরকম সভা-সমাবেশ ও মিছিল না করতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এলাকায় কঠোর নজরদারি করা হয়। কিন্তু ছাত্রদের তৎপরতা এই বাধা পেয়ে আরো গতিশীল হয়। সবাই ২০ ফেব্রুয়ারির রাতে হরতালের গ্রেফতারি আতঙ্ক মাথায় করে একুশ ফেব্রুয়ারির যে যার মত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়। অজয় রায়ের ভাষায়, "২০ ফেব্রুয়ারির রাত টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটলো" (রায়, ২০১৬:৬১)। দিনাজপুর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নির্দেশনা ২১ ফেব্রুয়ারির সকাল দশটায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ প্রাঙ্গনে সবাই উপস্থিত হন। ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজের ক্লাস বর্জন করে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষার্থীরা ছাড়াও মহারাজা স্কুল, জিলা স্কুল, সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাই মাদ্রাসা, জুবিলী স্কুল ও একাডেমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ মাঠে সমবেত হয়। মিছিল শুরু হয় বেলা ১১ টায়; এবং তা প্রায় এক মাইল লম্বা হয়। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নানা ধরনের স্লোগান লেখা পোস্টার ছিল। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগানে রাজপথ উত্তাল ছিল। শহর জুড়েই সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। দোকানপাট, অফিস আদালত বন্ধ থাকে। গাড়ি- ঘোড়া, এমনকি ট্রেন চলাচল ও বন্ধ হয়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ চত্বর থেকে বের হওয়া মিছিল মুন্সিপাড়া, মালদহ পট্টি, জেলখানার পেছন রাস্তা, লিলি সিনেমার মোর হয়ে তৎকালীন হাই মাদ্রাসা মাঠের সমবেত হয়। এদিন বিকেলে একাডেমি স্কুলের কংগ্রেস মাঠে এক বিশাল বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা বিভাগে তরুণ শিক্ষক মাহমুদ মোকাররম হোসেন। বক্তৃতা করেন নুরুল হুদা মির্জা, আসলে উদ্দিন আহমেদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাফিজ প্রমুখ (বিশ্বাস, ২০১৩:২৬০)। জনসভার পর সন্ধ্যায় আবার শহরে প্রতিবাদী মিছিল

বের করা হয়। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। আহমেদ রফিক লিখেছেন, "একুশে ফেব্রুয়ারির সকাল থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন সড়কের ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল। সেই মিছিল যেন এক অন্তহীন যাত্রা পথ পরিক্রমা, যা শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা ময়দানে এসে শেষ হয়। এরপর স্কুল ময়দানে অধ্যাপক মাহমুদ মোকাররম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র জনসভা। এ সভায় জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন নুরুল হুদা মির্জা ছোটি, আসলে উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাফিজ প্রমুখ। জনসভা শেষে সন্ধ্যায় আবারও শহরে প্রতিবাদী মিছিল "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগান কণ্ঠে ধারণ করে (রফিক, ১৭৮)।

দিনাজপুর জেলার সর্বত্র ২২ ফেব্রুয়ারির স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট, শোকমিছিল ও বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে দূর লোকালয় পর্যন্ত। দিনাজপুরের পার্বতীপুর, বীরগঞ্জ, ফুলবাড়ী, বিরল প্রামাণিক পাড়া, শিবপুর, বক্তারপুর প্রভৃতি স্থানে হরতাল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। এমনকি দিনাজপুরের মহকুমা শহর ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ও এই আন্দোলনের ঢেউয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হতাহতের সংবাদ দিনাজপুর শহরে পৌঁছার পর থেকেই পুরো শহর উত্তাল হয়ে ওঠে। সকাল থেকে শহরের স্কুল, কলেজ, বাজার, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ২১ তারিখেই নেতারা নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্রেফতার এড়ানোর জন্য পরিচিত ও প্রথম সারির কর্মীরা যেন কেউ তাঁদের বাসায় রাত না কাটায়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারির দুপুরে সব বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মী ও ছাত্র -ছাত্রীরা কলেজ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। এখানে এসে সবাই কালো ব্যাজ ধারণ করে। পরে ধীরগতিতে একটি শোকমিছিল শহরের মূল রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে দিনাজপুর মহিলা সমিতির সামনে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। মাইকে অনেকটা ধারাবর্ণনার মতো সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একজন ছাত্রনেতা ভাবগম্ভীর কণ্ঠে চমৎকারভাবে একুশের বর্ণনা দিয়েছিলেন (রায়, ২০১৬: ৬১)।

শোকমিছিল শেষে ২২ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাজপথে নেমে আসে ক্রোধ, ক্ষোভ আর আবেগ নিয়ে। ছাত্রদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দেন সর্বস্তরের সচেতন মানুষ। এককথায় ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় দিনাজপুরের ভাষা-আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। মিছিলে-মিছিলে রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে স্লোগান ওঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'নূরুল আমীনের কল্লা চাই'। আন্দোলন গণ-আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। জনতা মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। বিক্ষোভ-মিছিল শেষে সেখানে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের নামকরা আইনজীবীরা, রাজনীতিবিদরা অনলবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্রনেতারাও হত্যার প্রতিবাদ জানান। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক তারেন্দ্র ভট্টাচার্য বক্তৃতার পর একটি কবিতাও আবৃত্তি করে শোনান। প্রবীণদের মধ্যে বক্তৃতা করেন হাজি মোহাম্মদ দানেশ, রহিমউদ্দিন আহমেদ, গুরুদাস তালুকদার, নূরুল হুদা মির্জা, শামসুদ্দিন আহমেদ, আফতাবউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাফিজ, তোজাম্মেল আলী প্রমুখ। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা ও নূরুল আমীনের ফাঁসির দাবি জানানো হয়। এদিন শোকসভায় আন্দোলনের ধারা চলমান রাখার ঘোষণা করা হয়(কবীর , ২০০৬: ১৩২)।

২২ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ভাষা আন্দোলনের যেসব কর্মসূচি পালিত হয়, সে প্রসঙ্গে *দৈনিক আজাদ* ও *আনন্দবাজার পত্রিকা* তেও সংবাদ প্রকাশিত হয়। এসব সংবাদ পত্রের ভাষ্য অনুযায়ী :

১. দিনাজপুর ,২২ ফেব্রুয়ারি- গতকল্য এখানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। কলেজ ও স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্লাসে যোগদান করে না। শহরের দোকানপাট গুলিও বন্ধ থাকে। ছাত্র-ছাত্রীগণের এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন পোস্টার সহ

বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবি সমূহ ধ্বনি করিতে এই শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও কাচারি প্রাঙ্গণ পরিভ্রমণ করে। অতঃপর অপরাহ্নে অধ্যাপক মকরম হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা বাঙ্গালা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা পরিবার দাবির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫ ফেব্রুয়ারি,১৯৫২)।

২. পার্বতীপুর (দিনাজপুর), ২২ ফেব্রুয়ারি। গতকল্য বেলা ১০ ঘটিকার সময় প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণ সমন্বয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা পার্বতীপুরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। এই দিন সমস্ত দোকানপাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হরতাল পালন করে। অতঃপর পার্বতীপুর হাই স্কুলের খেলার মাঠে এক বিরাট সভা হয়। সভায় পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে তাঁর চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। গণভোটের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলা নির্ধারণের দাবি করিয়া কতিপয় প্রস্তাবগৃহীত হয়। (রহমান , ১৯৯৮: ৬২৯)।

২২ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারির শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে নূরুল আমিন মার্কেটের নাম বদলিয়ে "শহীদ সালাউদ্দিন মার্কেট" রাখার সিদ্ধান্ত হলে রাত ৯.০০ টায় মোঃ কাসেমের নেতৃত্বে একদল যুবক মার্কেটে গিয়ে নূরুল আমিনের সাইনবোর্ড নামিয়ে দুমড়ে মুচরে ড্রেনে ফেলে দেয় । সেখানে "শহীদ সালাউদ্দিন বাজার" লেখা এক সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। সে সময় পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। চারদিন পর পুলিশ নতুন সাইনবোর্ডটি নামিয়ে ফেলে(*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, দিনাজপুর*, ২০২৪ : ৪৫৫)।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৩ ফেব্রুয়ারির দিনাজপুর জেলার ইতিহাসে স্মরণকালের বৃহত্তম বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ঢাকা থেকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ২২ ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ মিছিলেও হত্যা করা হয়েছে। ঢাকায় বিক্ষোভ-আন্দোলন তখনও অব্যাহত। এদিকে দিনাজপুরের ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ মেহরাব আলী লিখেছেন: সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী জোট গঠিত হয় দিনাজপুরে। মাতৃভাষার দাবি আদায়ের প্রশ্নে স্বতঃস্ফূর্ত তাড়নায় ঢাকার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের পরদিন প্রত্যুষেই দিনাজপুরে যে অগ্নিমুর্তি বিদ্রোহ জোট গড়ে ওঠে এর মতো রুদ্রচেহারা পূর্বে দিনাজপুরবাসীর মধ্যে আর কখনো দেখা যায় নাই (আলী ২০০২: ২০২)।

দিনাজপুরের ইতিহাসবিদ মেহরাব আলী আরও বলেন;- বলা বাহুল্য, দিনাজপুরের ভাষা-বিদ্রোহের নেতৃত্বে ও সংগঠনে যাঁরা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে তাঁরা ছিল অধিকাংশই স্কুল-কলেজের দুঃসাহসী ছাত্র, অনেক দুঃসাহসিনী ছাত্রীও ছিল জড়িত। সচেতন জনসাধারণও ভাষার প্রশ্নে পিছিয়ে ও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে নাই। অনেক ভাষাপ্রেমী কলেজ শিক্ষকও জড়িয়ে পড়েন; কিন্তু সরকারি কোপানলে পড়ে চাকরি যাওয়ার ভয়ে তাঁদের সক্রিয়তা ছিল কখনো ইতিবাচক কখনো নেতিবাচক। যদিও তৎকালে মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নাই এবং জনসাধারণের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম লীগপন্থি। কিন্তু ভাষার দাবিতে গোষ্ঠীগত বন্ধন ছিন্ন করে অধিকাংশ সচেতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি- শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, চিকিৎসক, বণিক-ব্যবসায়ী, নির্বিশেষে লোকসাধারণ ভাষাবিদ্রোহের সঙ্গে একান্ত তা ঘোষণা করেন। প্রত্যেক দিন চলে মিছিল ও মিটিং। বন্যার স্রোতের গতিতে উর্ধ্বশ্বাসে চারদিক থেকে দুঃসাহস নিয়ে জনসাধারণ ছুটে আসত মিটিং ও মিছিলে যোগদান করার জন্য। তখন ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল দিনাজপুর হাই মাদরাসা (এখন দিনাজপুর হাই স্কুল) ও দিনাজপুর ইনস্টিটিউট মাঠ। সন্ধ্যার পর গোপন শলাপরামর্শেরও আড্ডা ছিল দবিরের চায়ের দোকান (আলী, ২০০২: ২০৩)।

ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার সংবাদ দিনাজপুরে প্রচারিত হলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ২৩ ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন। তখন সবার মুখে মুখে বিক্ষোভের খবর ছড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুর শহরের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ থেকে দুপুর একটায় বিরাট বিক্ষোভমিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের সামনের সারিতে ছিল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, পরের সারিতে স্কুল-কলেজের মেয়েরা, তারপর স্কুল-কলেজের ছেলেরা, এরপর সাধারণ মানুষ। মিছিলটি শহরের প্রতিটি রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভমিছিলে প্রায় সবার হাতে কালো পতাকা ও বুকে কালো ব্যাজ ছিল। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের চোখে-মুখে এক ধরনের প্রত্যয় ও ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ পায়। যেসব রাস্তায় কখনোই কোনো মিছিল দেখা যায়নি, সেসব রাস্তায়ও মিছিলটি গিয়েছিল। লালবাগ, রামনগর, চাউলিয়াপট্টি প্রভৃতি এলাকা ঘুরে আসে। মিছিল যতই সামনে যায়, ততই নতুন নতুন মানুষ যোগ দেয়। এভাবে মিছিলটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে ওঠে (জুয়েল, ১৯৯১: ২৬)।

মিছিল চলাকালীন উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ঘটে। মিছিল দেখে মুসলিম লীগ নেতা অ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন আহমেদ ও খান বাহাদুর আমিনুল হক (ডুডু মিয়া) হাসপাতাল মোড়ে বিক্ষোভ-মিছিলে যোগ দিয়ে সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নেন। বিকেলে ইনস্টিটিউটের বিক্ষোভসভায় সভাপতি ছিলেন জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন আহমেদ। বক্তৃতা করেন নূরুল হুদা মির্জা ছোটি, মুহম্মদ দবিরুল ইসলাম, উকিল আমানউল্লাহ সরকার, মাহমুদ মোকাররম হোসেন, শামসুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাফিজ, নাসিম চৌধুরী প্রমুখ। সভায় মির্জা ছোটির আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে জনসভায় উপস্থিত মোয়াজ্জেম হোসেন, আহসানউদ্দিন আহমেদ, জলিলউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। সমাবেশে খান বাহাদুর আমিনুল হককে আহ্বায়ক করে একটি 'অ্যাকশন কমিটি' বা আন্দোলন পরিচালনা কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়। সংসদটি গঠন করা হয় প্রতিটি স্কুল থেকে দুজন ছাত্র-ছাত্রী ও কলেজের কিছু নেতাকে নিয়ে (জুয়েল, ১৯৯১: ২৭)।

সভায় অংশগ্রহণকারী জনতা বক্তৃতা শুনে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, তাঁদের আক্রোশ সরকারি সম্পত্তির ওপর গিয়ে পড়ে। সভাশেষে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা অদূরে অবস্থিত খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলিম লাইব্রেরি ও হলে হামলা চালায় এবং আগুন লাগানোর চেষ্টা করলে নেতাদের হস্তক্ষেপে লাইব্রেরি রক্ষা পায়। এদিন সন্ধ্যায় জনতা রেলস্টেশনে গিয়ে সরকার সমর্থিত *'মর্নিং নিউজ'* পত্রিকার প্যাকেটে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এরপর আন্দোলন যেন কোনোভাবেই বিস্তার লাভ না করতে পারে, তার জন্য মুসলিম লীগ সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন ও নির্যাতন শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে দিনাজপুর শহরটির আন্দোলনকারীদের দমনে পুলিশ ও প্রশাসন মাঠে নেমে পড়ে। ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও জেলা আওয়ামীলীগ মুসলিম লীগের সভাপতি এডভোকেট রহিম ও আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ মির্জা নূরুল হুদা ছোটি কে গ্রেপ্তার করেন। কয়েকদিন পর আছলেউদ্দিন, আব্দুল হাফিজ, অনিল রায়, আব্দুল মোতালেব, রফিক চৌধুরী প্রমুখকে পুলিশ আটক করে(*বাংলাদেশ জেলা গেজেটিআর দিনাজপুর*, ২০২৪ : ৪৫৬) ।এরপর অনেক দিন দিনাজপুরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস হয়নি এবং ছাত্র-ছাত্রীরা শোকসূচক কালো ব্যাজ ধারণ করে দিনাজপুরে ভাষা আন্দোলন দমনের জন্য চব্বিশ ফেব্রুয়ারির থেকেই পর্যায়ক্রমে নেতারা গ্রেফতার হওয়ায় এবং পুলিশি তৎপরতা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে যায় (বিশ্বাস, ২০২১: ২৬৩)।

২৬ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পুলিশি দমননীতির প্রতিবাদে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সাময়িক উত্তেজিত হয়ে ওঠে সমাবেশের জনতা। এতে সভাপতিত্ব করেন নূরুল হুদা মির্জার মা বিবি নবুওতন নেছা। তিনি দমন-পীড়ন বন্ধ করে তাঁর ছেলেসহ সব

বাজবন্দির মুক্তি দাবি করেন। একই দাবিতে হাই মাদরাসা প্রাঙ্গণেও একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রহিমউদ্দিন আহমেদ-এর স্ত্রী জোবেদা রহিম। তিনিও তাঁর স্বামীসহ সব রাজবন্দির মুক্তি দাবি করেন (জুয়েল, ১৯৯১: ২৯)।

এদিকে ২৬ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর শহরে ক্ষমতাসীল দলের নেতৃবৃন্দের আগমনে ছাত্ররা কালো পতাকা প্রদর্শন করে। এদিন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রী হাসান আলী ও মওলানা আব্দুল্লা বাকি জনসভা করার জন্য দিনাজপুরে আসেন। তাঁদের শহরে ঢোকার মুখে চেহেলগাজীর মাজারের কাছে ছাত্ররা অবস্থান নেয়। অজয় রায়সহ ২০-২৫ জন ছাত্রের একটি দল দার্জিলিং রোডের দুই পাশে কালো পতাকাসহ অবস্থান গ্রহণকরেন বেলা আড়াইটার দিকে। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন আসলেহউদ্দিন আহমেদ, তোজা, তারা, মন্টু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দের গাড়ি ছাত্রদের দিকে দ্রুত ধাবমান হলে তাঁরা রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ওই অবস্থায়ও ছাত্ররা কালো পতাকা প্রদর্শন করেন এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ও 'নূরুল আমীন নিপাত যাক' ধ্বনি তোলেন। গাড়িগুলো দ্রুত বেগে শহর অভিমুখে চলে যায়। মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী ছাত্রদের মুখোমুখি হতে সাহস পায়নি। সেদিন ভাষা-আন্দোলনকারী ছাত্রদের জন্য এটা ছিল অন্য রকম বিজয়।

তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন মহকুমা ও থানা শহরে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব আন্দোলনের বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর শহরের পার্শ্ববর্তী হাট বাজার, থানা শহর এমনকি মহকুমা শহরগুলোতেও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয়। বর্তমান ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই দিনাজপুরের মহকুমা প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ফলে ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় হিসেবে শহর ও গঞ্জের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করে ভাষা-আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২) সংঘটিত হয়। পার্বতীপুর, বীরগঞ্জ, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, বিরলের শহর-গঞ্জের স্কুলগুলোতে এর প্রভাব পড়ে বেশি। উর্দুভাষী বিহারি অধ্যুষিত রেলওয়ে শহর পার্বতীপুরে ভাষাসংগ্রামে আন্দোলিত হয় সুতীব্র গতিতে। দিনাজপুর শহরের আন্দোলনের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁরাও প্রতিবাদ পালন করেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ের হরতাল-ধর্মঘট সমর্থন করেন। পত্র-পত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমে ঢাকার আন্দোলনের খবর জানতে পারেন ঢাকায় গুলিবর্ষণ বর্ষণ ও দিনাজপুরে গ্রেফতারের প্রতিবাদে দে সভা ও মিছিল করে প্রতিক্রিয়া জানান। এসব তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারে।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঢাকায় গুলিবর্ষণের খবর বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এলাকায় এলাকায় ধর্মঘট-হরতাল পালিত হয়। একুশের পরবর্তী সময় দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'। (ইসলাম, ১৯৯০:)। একুশের গুলি শুধু বরকতের হৃদয়কে বিদীর্ণ করেনি, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কোমল মনকেও রক্তাক্ত করেছে। তারই সমবেদনায় সম্মোহিত হয়ে শহর-গ্রাম, হাট-বাজার, পথ-ঘাট সবখানে ভাষা আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। মূলত জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সমর্থনই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভিত্তিমূল।

প্রথমদিকে দিনাজপুরের ভাষা-আন্দোলন ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করেএবং গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কাজ করেছিল, কাজ করেছিল আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি। একদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ঢাকায় গুলিবর্ষণের কারণে, অন্যদিকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা একে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। দিনাজপুরে বায়ান্নর ২৪ ফেব্রুয়ারির থেকে মুসলিম লীগ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরুকরে। তাই আন্দোলনকারীরা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে এবং একুশের তাৎপর্য ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি প্রচার করতে থাকেন। সে সময় এটিও আন্দোলনের নতুন কৌশল হয়ে যায়।

এদিকে ২৫ ও ২৬ তারিখ আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার শুরু করা হলে তাঁরাও অনেকে দিনাজপুরের মহকুমা শহর ঠাকুরগাঁও, বিভিন্ন থানা শহর এবং গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে প্রচার চালায়। তা ছাড়া নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে পুলিশ সর্বসাধারণের প্রিয় মানুষ অ্যাডভোকেট রহিমউদ্দিন আহমেদ, নূরুল হুদা মির্জা ছোটি, আব্দুল হাফিজ, আসলেহউদ্দিন ও অনিল রায়কে গ্রেফতার করে। এছাড়া গ্রেফতার করা হয় মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ আলী সহ অনেক ছাত্রনেতাকে। দিনাজপুরে এসব প্রিয় নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জনমনে আগুন জ্বলতে থাকে। নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে দিনাজপুরের বিভিন্ন থানা শহর ও গঞ্জে বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুরে ভাষা-আন্দোলন কতটা ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তা জানা যায় ওই সময়কার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আন্দোলনবিষয়ক সংবাদ-প্রতিবেদনগুলো থেকে। ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারির ফুলবাড়ীতে এক প্রতিবাদী জনসভা হয়।

এ সম্পর্কে *দৈনিক আজাদ পত্রিকায়* বলা হয়;- গত ২৬ ফেব্রুয়ারির ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। ইব্রাহিম আখন্দ সভাপতিত্ব করেন। সভায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা এবং ছাত্রবন্দিদের মুক্তি দাবি করা হয়। গুলিবর্ষণের ব্যাপারে বেসরকারি তদন্ড় কমিটি দ্বারা গুলিবর্ষণের তদন্ড় এবং দোষী বলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম বিচার দাবি করা হয়। বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করিয়া সভায় কতিপয় প্রস্তাবগৃহীত হয়। সভায় নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অদ্য ফুলবাড়ী ও অন্যান্য বাজারে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা বিক্ষোভ ধ্বনিসহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে। (*দৈনিক আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

২৭ ফেব্রুয়ারির দিনাজপুর উকিল সমিতির এক জরুরি সভায় বাংলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয় এবং ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের নিন্দা করা হয়। (হোসেন, ২০২০: ১৮৫)। প্রতিবাদ করা হয় ভাষা-আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে হয়রানি, গ্রেফতার ও পুলিশি জুলুম-নির্যাতনের। একইসাঙ্গে দিনাজপুরের ভাষা-আন্দোলন দমনে পুলিশের পাশাপাশি মাঠে নামে মুসলিম লীগের নেতা-কর্মী ও গুন্ডারা। আইনজীবীদের প্রতিবাদসভায় ভাষা-আন্দোলনকারী নেতাকর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারির দিনাজপুরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ কালো ব্যাজ ধারণ করে বিক্ষোভ মিছিল করে। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় এ সংবাদ ছাপা হয় 'দিনাজপুরে ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ' শিরোনামে। তাতে বলা হয়, 'রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সম্পর্কে ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার জন্য এখানে ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ গত মঙ্গলবার হইতে ক্লাসে যোগদান করিতেছে না এবং ঢাকায় নিহত ছাত্রগণের জন্য শোকসূচক কালো ব্যাজ পরিধান করিতেছে। (*দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, দিনাজপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

পঞ্চগড় (দিনাজপুর), ২৯শে ফেব্রুয়ারী-ঠাকুরগাঁও মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব গমীরউদ্দীন প্রধানের সভাপতিত্বে তেতুঁলিয়া, পঞ্চগড়, বোদা ও দেবীগঞ্জ থানার জনসাধারণের এক সভা হয়। ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বোতভাবে পালন, পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য সরকারের নিকট হাইকোর্টের জজদের লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং এ সম্পর্কে মুসলিম লীগ কর্তৃক আরও একটি নিরপেক্ষ বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য প্রাদেশিক লীগকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাবগৃহীত হয়। সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী যদি কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা দল পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার কু-উদ্দেশ্যে নিরীহ জনসাধারণকে বিপদগামী করিয়া থাকে তবে

উক্ত ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়া অপর একটি প্রস্তাবগৃহীত হয়। (*আজাদ*, ৬ মার্চ, ১৯৫২)।

২ মার্চ আমেনা খাতুনসহ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন জনসভা থেকেই ভাষা-আন্দোলন আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এরপর আর আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। একদিকে নেতারা বন্দি হওয়ায় নেতৃত্বের সংকট, অপরদিকে পুলিশি নির্যাতনের বাড়াবাড়ি; ফলে দিনাজপুরে ভাষা-আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হতে থাকে (বিশ্বাস,২০২১:২৬৫)। দিনাজপুরের শিবপুরে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত একটানা ধর্মঘট পালিত হয়। স্থানীয় স্কুল মাদ্রাসার ছাত্ররা এ কর্মসূচি পালন করে। তারা মিছিল বের করে এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার দাবি জানায় এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ করে। দিনাজপুরের এই নিভৃত পল্লীর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকা উল্লেখ্য আছে: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গত ২১ ফেব্রুয়ারির ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদস্বরূপ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি স্কুলের ও পার্শ্ববর্তী মাদরাসার ছাত্রগণ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ১ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করে। সভা করিয়া শোভাযাত্রা ও স্লোগান দ্বারা এই কয়দিন তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ও ছাত্রহত্যার জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। স্থানীয় হাট-বাজারগুলিতে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া ও বিখ্যাত হাট বিরামপুরের কেটরায় আর একদিন পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। গত ১ মার্চ তারিখে ছাত্র ও জনসাধারণ মিলিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার আয়োজন করে। সভায় আটক বন্দিদের মুক্তি দাবি করিয়া এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাইয়া বিভিন্ন প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয়। (*সাপ্তাহিক সৈনিক*, ৮ মার্চ, ১৯৫২)।

২ মার্চ দিনাজপুর শহরে জনাব রহিমুদ্দিন বি. এল. ছাত্রনেতা নূরুল হুদা, কাদের বখশ ও আমেনা খাতুন সহ পুলিশ গ্রেফতার আরও কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় (*আজাদ*, ৬ মার্চ, ১৯৫২)। দিনাজপুরের বিরলে ৫ মার্চ হরতাল পালিত হয়। হাট-বাজার, দোকানপাট বন্ধ থাকে। ছাত্র-জনতা শোভাযাত্রা বের করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'গুলিবর্ষণের বিচার চাই' স্লোগান তুলে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জনাব এস. এম. ইসহাকের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিরলের ভাষা আন্দোলনের এই সংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদ পত্রিকায়। ওই সংবাদে বলা হয়, 'ঢাকায় গুলিবর্ষণের ফলে নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকল্পে গতকল্য সমস্ত দিন এখানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। স্থানীয় তিনটা রাইস মিল এবং হাট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। ছাত্র ও জনসাধারণ এক বিরাট মিছিল সহকারে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'গুলিবর্ষণের বিচার চাই' প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্নে স্থানীয় হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এস. এম. ইসহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বাংলা ভাষা আন্দোলনে নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় (*দৈনিক আজাদ*, ১০ মার্চ, ১৯৫২)।

ভাষা আন্দোলনে দিনাজপুরে নারী সমাজ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে কেন্দ্র করেই শুরুহয় প্রথম আন্দোলন। এ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা, বিশেষ করে ছাত্রীরাও রাজপথে নেমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" এমনই শ্লোগানে দলে দলে তারা নেমে এসেছিলেন রাজপথে। ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কেউ কারা ভোগ করেছেন কেউ ফেরারি জীবন যাপন করেছেন কেউ লাঠিপেটা গুলী বর্ষণে আহত হয়েছেন। তারা যথেষ্ট সাহস নিয়ে সাবধানতার সঙ্গে যোগদান করেছেন, মিছিল- মিটিংয়ে পোস্টার লাগিয়েছেন দেয়ালে দেয়ালে, আহত কর্মীদের সেবা করেছেন, অস্ত্র হাতে এগিয়ে এসেছেন, মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন। এর আগে কোনো আন্দোলন ও সংগ্রামে এ রকম ব্যাপক হারে নারীদের সক্রিয়

অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়নি। এদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে এটি ছিল একটি উল্লেযোগ্য মাইলফলক। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায়, তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক পটভূমিতে ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিল না দিনাজপুরের নারীসমাজ। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকায় সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রীরা। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন দিনাজপুর গার্লস স্কুল ও স্বারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। সে সময় দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে কিছু রাজনীতি-সচেতন অভিভাবক এবং শিক্ষিকার সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীগণ মূলত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন, খুব অল্পসংখ্যক নারী ছিলেন উচ্চবিত্ত শ্রেণির। তবে নিম্নবিত্ত নারীরা আন্দোলন-সংগ্রামে তেমনভাবে অংশগ্রহণ করেনি। যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তারা পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বন্ধু-বান্ধব, রাজনৈতিক কর্মী ও রাজনৈতিক দলের ছাত্র শাখার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এ সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রীকর্মীরাই নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সর্বোপরি এখানকার ভাষা আন্দোলনে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে উভয়ের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত (আলী, ২০০২:২০৮)।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রীনেত্রী কচিমনি ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগামী ও কুসংস্কারমুক্ত। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে খুকুমনি, হমিদা হক, আমিনা দানেশ (কৃষক নেতা হাজি মোহাম্মদ দানেশের মেয়ে), রওশন আরা (বালুবাড়ি নিবাসী অ্যা. আফতাবউদ্দিনের বোন), জিনাতুল আরা (ভাষাসংগ্রামী অ্যাড. আব্দুল মোতালিবের বোন) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি আন্দোলন থেকে বাদ ছিলেন না অনেক শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত নারীগণ। যেমন: নূরজাহান বেগম, ফাতেমা বেগম, শাহজাদী বেগম, বিশিষ্ট সাংবাদিক লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯) প্রমুখ। লায়লা সামাদ ছিলেন দিনাজপুরের সুসাহিত্যিক এবং ভাষা আন্দোলনে যোগদানকারী খান বাহাদুর আমিনুল হকের সন্তান। লায়লা সামাদ নিজেও ছিলেন দিনাজপুরের গৌরব। তৎকালীন কুসংস্কার শাসিত দিনেও বহুগুণের অধিকারী ছিলেন এই নারী। উচ্চশিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি লেখক, সাংবাদিক, নৃত্যশিল্পী ও নাট্যশিল্পী হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি নারী প্রগতি নেত্রী জাইফুল রায়ের সঙ্গে যোগ দেন ভাষা আন্দোলনে। ভাষা-আন্দোলন চলাকালীন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তিনি নিবেদিতা নাগের সঙ্গে দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়েছেন। প্রগতিশীল রাজনীতি এবং নারী অধিকার আদায়েও ছিলেন অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকায়। দিনাজপুরের ভাষা-আন্দোলনকে তিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিত করেন। এছাড়া দিনাজপুরের অনেক সচেতন নারী ছিলেন, যাঁরা গৃহিনী হয়েও আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে গুরুদায়িত পালন করেন। তারা নির্দ্বিধায় সংসারের অবরোধ বেষ্টনীকে ছিন্ন করে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারী অধিকারের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভাষা আন্দোলনের মিটিং-মিছিল হলেই তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের আন্দোলনে যোগদানের এমন দৃশ্য দিনাজপুরে পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। তখন যুগটি ছিল এমন, যখন সামাজিক-রাজনৈতিক কাজে প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের পাশাপাশি অবস্থানের কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব (জুয়েল, ১৯৯১: ২১)।

একুশে ফেব্রুয়ারির পর পুলিশের হামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রতিবাদ-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ভাষাসৈনিক নূরুল হুদা মির্জা ছোটির মা নবুতন নেসা, মাদরাসা মাঠে আরেকটি প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি রহিমউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী জোবেদা রহিম। দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত পরিবারের নারীরা বিভিন্নভাবে আন্দোলনকারীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নারীকর্মী কচিমনি ও খুকুমনি আন্দোলনের মিছিল শেষে কিংবা মিছিল চলাকালীন পানি পানসহ মেয়েদের মিছিলে শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে ছেলেদের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

দিনাজপুরের আরও যেসব নারী ভাষা আন্দোলনের সময় রাজপথে নেমেছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন রাজনৈতিক পরিবারের। শুধু তা-ই নয়, ২ মার্চ গ্রেফতার করা হয় আমেনা দানেশকে। অবশ্য তিনি ৩ দিন পর কারামুক্ত হন। জেলায় জেলায় ভাষা-আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায়, ১৯৫২ সালের সেই সংগ্রামমুখর দিনগুলোতে শহরের নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অনন্য। মরহুম কাদের বক্স উকিল সাহেবের স্ত্রী এবং ভাষাসংগ্রামী নূরুল হুদা মির্জার মা কয়েকটি সভায় সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মমতাজ বেগম ও হামিদা খাতুনসহ আরও কয়েকজন তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (কবীর, ২০০৬: ১৩২)।

ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে অসংখ্য শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। একই চেতনায় ভাষা আন্দোলনের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ চত্বরে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার। ১৯৫৩-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ২১ ফেব্রুয়ারিতে এই শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ১৯৫৬ সালে কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি গোলাম কিবরিয়া ও জি.এস মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে ছাত্র সংসদ শহীদ মিনারটি সংস্কার করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় শহীদ মিনারটি আবার ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর সরকারি বাধা-নিষেধ ডিঙ্গিয়ে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরি করে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হতো। এই সময় প্রভাত ফেরিতে একটি গান গাওয়া হতো। গানটি ছিল: (বিশ্বাস, ২০১৩: ১৯৮)।

> ভেঙ্গেছে আমার শান্ত নীড়,
> ভেঙ্গেছে শহীদ মিনার,
> দিকে দিকে ঐ বেজে ওঠে
> অগ্নিবীণার গান।

১৯৬৭-১৯৬৮ সালে কলেজ ছাত্র সংসদ বড় আকারে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শহীদ মিনারটি আবারও গুঁড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজের তৎকালীন ছাত্র সংসদ নতুন করে কলেজ চত্বরে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে এই শহীদ মিনারটি উদ্বোধন হয়। এরপর প্রতি বছর কলেজ প্রাঙ্গাণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এসেছে দিনাজপুরের সর্বস্তরের মানুষ।

দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলনে গ্রামীণ পর্যায়ের আলোচনায় সমুদ্র তরঙ্গের কিছুটা উপলব্ধি পাওয়া যায়। একুশে ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে গ্রাম-গঞ্জে আরও সভা-সমাবেশ হয়েছিল। অসংখ্য জায়গায় বিক্ষোভ-মিছিল হয়েছিল। কিন্তু রক্তিম ও প্রতিবাদমুখর দিনগুলোর খতিয়ান কমই আছে। আন্দোলনটি যে শুধু উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল না নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার আকাঙ্ক্ষার পরিণতি- গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট প্রতিবাদ ও বিক্ষোভগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ দেশের সাধারণ শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ তাদের মুক্তির বীজ দেখতে পেয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনে। এ যেন মাতৃভাষার প্রতি চিরন্তন হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ। দিনাজপুর সহ সমগ্র দেশে সংঘটিত এই ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অবশ্যম্ভাবী করে।

তথ্যসূত্র

Akanda, Safar Ali (2013), *Language Movement and the Making of Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka.

আলী, মেহেরাব (২০০২), *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র-৫(লেখক স্বয়ং)*, দিনাজপুর।

বার্ণিক, এম. এ (২০০০), *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস: ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ*, এ. এইচডি পি এইচ, ঢাকা।

জুয়েল, আজহারুল আজাদ (১৯৯১), *ভাষা আন্দোলনের দিনাজপুর*, (লেখক স্বয়ং), ঢাকা ।

বিশ্বাস, মোজাম্মেল (২০২১), *দিনাজপুরে ভাষা-আন্দোলন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দিন (২০১২), *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খন্ড সুবর্ণ সংস্করণ, ঢাকা।

রায়, অজয় কুমার (২০১৬), *ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস*, গণপ্রকাশ, ঢাকা ।

রায়, অজয় (২০১০), 'দিনাজপুরে বায়ান্ন ভাষা আন্দোলন: আমার স্মৃতি', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ।

বিশ্বাস, ড. সুকুমার (১৯৯৫), *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, কলকাতা সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

ইসলাম রফিকুল (১৯৮৯), *'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' একুশে প্রবন্ধ ৮৯*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

হেলাল, বশীর আল (১৯৮৫), *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

ভৌমিক, রিতা, *২৪ জন ভাষা সংগ্রামীর জীবন কথা*, ধ্রুপদ।

হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার (২০০৩), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), (২০০৪), *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা*, ঠাকুরগাঁও, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

হক, মোহাম্মদ লুৎফুল (২০০৮), *দিনাজপুরের ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮*, প্রথম আলো, বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি।

আলী, হেমায়েত সম্পাদিত (১৯৪৯), *নওরোজ সপ্তম বর্ষ*, প্রথম খন্ড, দিনাজপুর।

বসির, আমানুল্লাহ ও ফাইজুল ইসলাম সম্পাদিত (২০০৬), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা ।

আহমদ, রফিক, (২০১৯), *ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মমতাজুর সম্পাদিত (১৯৯৮), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *রাজশাহী বিভাগ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, রাজশাহী ।

ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী (সম্পাদিত) (২০২৪), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, দিনাজপুর*, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ইসলাম, নুরুল (১৯৯০), *সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

আহমদ, কামরুদ্দীন (২০২০), *মধ্যবিত্তের আত্মকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

Morning News, December, 7th 1947

আন্দোলন বাজার পত্রিকা, ২৫ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

দৈনিক আজাদ, ২৭ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, ৬মার্চ, ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, ১০মার্চ, ১৯৫২

সাপ্তাহিক দৈনিক, ৮ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

[**Abstract :** The language movement was the first milestone in the establishment of an independent and sovereign Bangladesh. This movement to establish the Bengali language as the state language was the first resistance movement of the student population against Pakistani rule and exploitation. In the Pakistan state created under the guise of the two-nation theory and in the reality of the then political situation, the language movement created a new enthusiasm by awakening a non-communal, liberal and progressive spirit against the religious, radical and backward thinking of the Muslim League government and its supporters. Through this, the conscious student, population of East Bengal was inspired with a sense of nationalism based on language and culture, which led them to the desired goal of establishing an independent and sovereign Bangladesh state through subsequent movement struggles. Although the state language movement initially began among conscious intellectuals and political circles, it later spread among all levels of people in East Bengal. In this continuity, Dinajpur, known as the fertile land of the movement, also had a great impact. In this, senior politicians including farmer leader Haji Muhammad Danesh contributed, as did student and youth leaders Mohammad Dabirul Islam, Nurul Huda Mirza Chhoti and many young leaders and activists who played a historic and important role. Although the language movement was initially limited to students, youth, progressive political activists and intellectuals of Dinajpur city, in 1952 people from all walks of life in the city and villages participated in it. In 1948, mainly in Surendranath College and various schools in Dinajpur, and later in 1952, the language movement spread to villages and towns of various police stations including Thakurgaon Panchagarh, a subdivision of Dinajpur. Dinajpur's role in the language movement was well-organized and much more advanced than that of the regional district cities. One of the reasons for this was the leadership of student leaders of Dinajpur by involving various organizations with the Dhaka-centered movement, who played a leading role in the language movement in Dhaka and Dinajpur.]